International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-IV, January, 2020, Page No. 09-15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.9-15

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমান সমাজ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প

মোঃ আলাউদ্দিন
গবেষক, বাংলা বিভাগ বিশ্বভারতী, কলকাতা

Abstract

After the defeat in the battle of palassey, the was snatched from the Muslim rulers by the britishers. They refused to receive the modern education by the English. But in the 19Th century they were motivate by some great personalities and they started to take education. This apart, in the 1st half of the 20th century an educated middle class muslim society emerged and Dhaka university had played a significant role in this regard. But during the partition, most of the educated muslims went to Pakistan, only uneducated muslims remained in the west Bengal. But both the educated and uneducated muslims did not take any initiative in developing the Bengali culture. A cultural formality was very much alive among hindus and muslims. This culture was very much influenced by oahobi and faraji movement, but it was vibrant among them in their rural culture. Later this culture eroded due to religion technological development. Then muslim culture and society have been reflected in Syed Mustafa Siraj's 'tarachander hasi', 'urocithi', 'ekti onusondhan', 'panipirer dorga', 'pyatlar', 'saj vese geche', agniboloi' and 'rustom o sohoraber brittanto' etc.

Key words: palassey, Dhaka University, Oahobi, Faraji, Rural culture.

পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেলে ইংরেজদের দেওয়া আধুনিক শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মুসলমান সমাজ। কিন্তু উনিশ শতকে কয়েকজন মুসলমান সমাজ সংস্কারকদের প্রভাবে এই সমাজের মধ্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ খানদানি ও শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত ওপার বাংলায় চলে গিয়েছে। এপার বাংলায় পড়ে থেকেছে সমস্ত নিরক্ষর মুসলমানেরা। সাংস্কৃতিক দিক থেকে খানদানি বা অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে থেকে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে কোনরকম ভূমিকা দেখা যায়নি। লৌকিক স্তরে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ে পূর্ণ যে সংস্কৃতি গ্রামীণ জীবনে বর্তমান

ছিল, ওহাবি ও ফরাজি আন্দোলন সেখানে প্রভাব ফেললেও গ্রামীণ জীবনে সেই সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় ও উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার কারণে সেই সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির অন্তর্গত খোসবাসপুর গ্রামে ১৯৩০ সালে জন্ম গ্রহণ করেছেন। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল বা হিজলের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মানুষজনকেও খুব কাছ থেকে জেনেছিলেন। ১৯৫০ সালে আলকাপ দলে দীর্ঘ ছ'বছর যুক্ত থাকার জন্য এই গ্রামীণ জীবনকে সহজেই জানার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর পক্ষে। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে তিনি ছোটগল্পের জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। গ্রাম ও গ্রামের মানুষজনই তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে। গ্রামীণ জীবন নিয়ে লেখা তাঁর কাছে দায়বদ্ধস্বরূপ বলে মনে হয়েছে। কারণ দেশভাগের পরে গ্রামেও অনেক ভাঙ্গা গড়া হয়েছে। গ্রামের এই ভাঙ্গা গড়া জীবনের সাক্ষী তিনি। তাই এই জীবনকে নিয়ে না লেখা তাঁর কাছে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জীবন নিয়ে লিখতে বসে হিন্দু মানুষ মুসলমান মানুষ আলাদা বলে কিছু মনে করেননি। যথার্থ বাঙালি (হিন্দু ও মুসলমান) জীবনের চিত্র তাঁর কলমের ডগা দিয়ে উঠে এসেছে। দেশভাগ পরবর্তীকালে এপার বাংলার মুসলমান সমাজ গোড়া থেকে পথ চলা শুরু করেছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে দেশভাগ পরবর্তীকালের এই মুসলমান সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চিত্রটি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সংস্কৃতি বলতে সাধারণভাবে ব্যক্তি বা সমষ্টির অর্জিত আচরণ বা সংস্কার কে বোঝায়। সত্য, সুন্দর ও সৌন্দর্যের সাধনা করে থাকে সংস্কৃতি। সকলের সংস্কৃতি এক নয়, আলাদা। তাই এক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন হয়। একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণির সংস্কৃতিও আলাদা হয়ে থাকে। মুসলমান সমাজের সূচনাকাল থেকে উচ্চ বা অভিজাত শ্রেণি ও নিম্ন বা ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান নিয়ে বাংলায় যে মুসলমান সমাজ বিন্যাস দেখা গিয়েছিল --এদের সংস্কৃতি ছিল ভিন্নমুখী। প্রথম শ্রেণিটি আরব, ইরাক ও ইরানের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল আর নিম্নশ্রেণির মুসলমান সম্প্রদায় এদেশের মাটিতে আবদ্ধ থেকে এক প্রকার মিশ্র ইসলামি সংস্কৃতি বুকে ধারণ করেছিল।

সংস্কৃতির বিকাশে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় সামগ্রিকভাবে বাংলার মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু ধর্মকে আশ্রয় করে অতীতের দিকে মুখ রেখেছিল। এখানে সমগ্র মুসলমান সমাজ বলতে ঐ অভিজাত বা উচ্চ শ্রেণির অবাঙালি মুসলমানদেরই কথা বলা হচ্ছে। কারণ দারিদ্রের কারণে যে নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের মুসলমান শাসকদের সময়েই শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি, ব্রিটিশ শাসনকালে সেই অবস্থানেই থেকে তাদের পক্ষে যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না তা বলাই বাহুল্য। তাই পরবর্তীকালে এই উচ্চ-শ্রেণির মুসলমানরা শিক্ষার দিকে এগিয়ে এলেও নিম্নশ্রেণি বাঙালি মুসলমানরা এক্ষেত্রে জড়বস্তুর মতো পূর্বের অবস্থানেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে অভিজাত মুসলমানদের কোনরূপ ভূমিকাই দেখা যায়নি, সেখানে নিম্নশ্রেণির বাঙালি মুসলমানদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের লোকসাহিত্যের নিদর্শনগুলিই তার প্রমান। দেশবিভাগ পরবর্তীকালেও এই ইতিহাসের বদল ঘটেনি। যদিও ওহাবি ও ফরাজি আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান লৌকিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক আগেই প্রতিবন্ধকতা জুগিয়েছিল। তবুও গ্রামীণ মুসলমান সমাজে এই দুই সম্প্রদায়ের সংমিশ্রিত লৌকিক সংস্কৃতি দীর্ঘকাল ধরে প্রবহমান ছিল। যদিও নিম্নশ্রেণির মুসলমানের তুলনায় উচ্চ বা অভিজাত মুসলমান ছিল সেখানে একেবারেই কম। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পগুলিতে এই মুসলমান লৌকিক সংস্কৃতির অনেক চিত্র উঠে এসেছে।

গ্রামীণ নিরক্ষর মুসলমান সম্প্রদায় দারিদ্রের জন্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাছাড়া তারা যে পেশাগুলোতে নিযুক্ত থাকে, সেখানে শিক্ষা কোন কাজেও লাগে না। জীবিকা বা অর্থ উপার্জনে সেখানে শ্রমই একমাত্র অবলম্বন, দরিদ্র এই মুসলমানেরা সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণকে জীবন বা জীবিকায় ক্ষতিকর বলেই মনে করে। তারা মনে করে, **"দু'কলম শিখলেই তো মামলাবাজ হয়ে যাবে। তাছাড়া বাচ্চারা হাঁটতে শিখলেই কত সাংসারিক কাজে লাগে।**

লেখাপড়া শিখে আলসে বাবু হয়ে যাবে না? তখন কে করবে গরু চরানো বা চাষবাসের কাজ?"[১] তবে আধুনিক শিক্ষার প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকলেও, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি তীব্র ঝোঁক দেখা গিয়েছিল সমগ্র মুসলমান সমাজে। তাই মাদ্রাসার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিল এই সমাজ। দেশভাগের আগে কিছু বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রচেষ্টায় মুসলমান সমাজকে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলার উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে কিছু মুসলমান মধ্যবিত্ত গড়ে উঠলেও এইরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন মুসলমান সমাজে নেতৃত্ব দেবার কোনরকম উদ্যোগ দেখা যায়নি। স্বভাবতই এই মুসলমান সমাজ ধর্ম ভীরু কিছু মুসলমান ও আলেম সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র পরলোকের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণকেই যথেষ্ট বলে মনে করেছিল।

মুসলমানদের সাধারণত মসজিদে ধর্মকথা বা ধর্ম শিক্ষা ছাড়াও মসজিদের বাইরে ধর্ম শিক্ষার যে আয়োজন বা ব্যবস্থা তাকে সাধারণভাবে 'জলসা' বলে। এখানে নির্দিষ্ট কোনো এলাকা বা অঞ্চলের মসজিদের অন্তর্গত মৌলবি মৌলানা ছাড়াও আরও অনেক মৌলানাকে ধর্মীয় বা ইসলামি বিষয় সংক্রান্ত বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়। তাই জলসা ধর্মীয় শিক্ষামূলক এক অনুষ্ঠান। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'অনুপ্রবেশ' গল্পে এই জলসার কথা রয়েছে। সেখানে মুসলমানদের নিরাসক্তির কথা উঠে এসেছে। কারণ মনে রাখতে হবে যে, গ্রামীণ অধিকাংশ মুসলমানই খেটে খাওয়া শ্রমজীবী নিরক্ষর। এইধরনের ধর্মীয় মজলিশে তাই তাদের আসক্তি দেখা যায়নি। তাই ধর্মীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোনটিই গ্রহণ করার সৌভাগ্য এই নিরক্ষর মুসলমানদের হয়নি।

তবে খানদানি বংশের মধ্য থেকে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণের দিকটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বিভিন্ন ছোটগল্পে উঠে এসেছে। এই দিক থেকে তার 'হঠাৎ আলোয়', 'ডালিম গাছের জিনটি', 'রুস্তম ও সোহরাবের বৃত্তান্ত', 'মৃত্যুর ঘোড়া', 'নবাবনন্দিনী', এবং 'মরীচিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দরিদ্র যে সমস্ত মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর দেখা গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে সেখানে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা দেখা গিয়েছে। এদিক থেকে 'একটি অনুসন্ধান', পানিপিরের দরগা, এবং 'প্যাটলার' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য।

দরিদ্র এই মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে কেউ কেউ শিক্ষা লাভ করলে বাধা আসে চারিদিক থেকে। এই বাধা নিজের আত্মীয়দের কাছ থেকেও পাওয়া যায়। তাঁর 'উড়োচিঠি' গল্পে কালুডিহি এমনই এক নিরক্ষর গ্রাম যে সেখানে প্রথম একজন পিয়ন গেলে গ্রামের মোড়লসহ সব মানুষের কাছে তা রহস্য ঠেকে। এইরকম গ্রামে বদরুর সদরুর নাতি হামিদ লেখাপড়া শিখলে তাদের মতো গ্রামের সহজ সরল বোকা মানুষের কাছে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই হামিদ যেন জটিল হয়ে ওঠে। তাঁদের কাছে সে হয়ে ওঠে মামলাবাজ বা চক্রান্তকারী চরিত্র। তাই তারা তাঁকে লেখাপড়া শেখা থেকে বিরত করতে চেয়েছিল। আর আফতাব মৌলবির মতো সমাজের আলেম সম্প্রদায়ের কাছে বেশি পড়াশোনা করা মানেই 'গোমরা' হয়ে যাওয়া।

মুসলমান সমাজ অশিক্ষিত বলেই শাস্ত্রের নিহিতার্থ বা আসল অর্থ বোধ দিয়ে ধরতে পারেনা। সদরু হামিদকে আদম হাওয়ার প্রসঙ্গ বা কাহিনি তুলে ধরে বলে:

> *"-বাবা আদম গন্দমবিরিক্ষের ফল খেয়েছিল। তারপর খোদা তাকে ডাকলেন, তো আদম জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। কারণ কী? না- লজ্জা। ফল খেয়ে জ্ঞান জন্মেছে নিজেকে ন্যাংটো দেখছে। আঞ্জির গাছের পাতায় লেঙ্গখানা ওপড়াতে পারবি। আরে! ঢাকলেও কি ঢাকা যায়? যায়না। শরীল থেকে লেঙ্গখানা ওপড়াতে পারবি?"*[২]

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল বলেই আদম হাওয়া প্রথম মানব মানবি নিজের নগ্নরুপকে দেখতে পেয়েছিল আর তারপর থেকেই তারা স্বর্গ থেকে নেমে মর্ত্যে এসেছিল। তাই জ্ঞান বৃক্ষের ফল না খেলে নিজেদের আসলরূপ বা

নগ্নরূপ সত্যিই তারা দেখতে পেতনা। জ্ঞানের শিক্ষা না নিলে কালুডিহির মানুষেরা নিজেদের সত্যরূপ যে দেখতে পাবেনা-এই বোধ সদরুর মতো নিরক্ষর চাষাভুসো মানুষের হয়না। এই অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষেরা যুগ যুগ ধরে একই অবস্থানে থেকে যেতে চায়। তায় বদরু বলে, **"এই যে আমাকে দেখছিস, একফালি বস্তর সার করে থেকেছি। তাতে কি আমার ক্ষেতি হয়েছে কিছু? ওড়ে ছোড়া, কালুডিহির সেসব মানুষজন এখন গোরে। তারা কি তোদের চেয়ে কম সুখে ছিল, না তোদের চেয়ে বেশি দুখে ছিল?"**[৩] নিজের নিজের অবস্থানে সবাই কম বেশি সুখে থাকে। কিন্তু শিক্ষা না পেলে একটি সম্প্রদায় বা জাতির সাংস্কৃতিক কোন বিকাশ ঘটেনা -- এই সত্যটি এই গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষেরা কোনভাবেই বুঝতে পারেনা।

উচ্চবংশ বা অর্থনৈতিক দিক থেকে সামান্য উপরে অবস্থানকারী মুসলমান সমাজে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা দেখা গিয়েছে। 'রুস্তম ও সোহরাবের বৃত্তান্ত' গল্পে পারুর পাশাপাশি রুনাও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে। শুধু তাই নয় রুনা স্কুল শিক্ষকতার পাশাপাশি এম.এ পাশও করেছে। 'ডালিম গাছের জিনটি' গল্পে জেরাত মির্জার খানদানি বংশের পুরুষ জেরাত মির্জার কন্যা দিলবাহার উচ্চ শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বি.টি পাশ করেছে এবং স্কুলে শিক্ষকতা করেছে। 'জুলেখা' গল্পে গল্পকথকের পিতা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্কুল শিক্ষক। এই গল্পের গল্পকথকের মামা ছিলেন ইংরেজ আমলের পরাক্রান্ত এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'কুর্শিনামা' গল্পে গল্পকথক আবু হোসেন খরাসানি নিজে ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তাঁর বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর চাচা ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। একসময়ে মুসলমান সমাজে অন্ধকার দশা থেকে মুক্তি খুঁজতে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। বলাই বাহুল্য সেই সমস্ত মুসলমান ছিল তৎকালীন সেই খানদানি বংশের বা অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটামুটি একটি শ্রেনিতে অবস্থানকারী এইসব মুসলমানেরা। দেশভাগ পরবর্তীকালের মুসলমান সমাজের চিত্র মূলত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে দেখা গেলেও, দেশভাগ পূর্ব মুসলমান সমাজের এই শিক্ষা সংস্কৃতির চিত্রটিও উঠে এসেছে। আসলে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কালের লেখক। এই কাল কোন একটি সীমায় সীমায়িত নয়। বৃহত্তর এক কালের এবং সেই কালের মানুষের জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। আর তাতেই সমকালের মুসলমান সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতির চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি অতীতের এই সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতির দিকটি উঠে এসেছে।

সংস্কৃতির দিক থেকে অবাঙালি বা খানদানি মুসলমানেরা বাংলা সংস্কৃতির প্রতি সেভাবে আগ্রহ দেখায়নি। সেখানে অবাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের এদিক থেকে এক বিরাট পার্থক্য সবসময়েই বিদ্যমান ছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক তাঁর 'প্রেম ঘৃণা দাহ' উপন্যাসে বলেছেন, **"অবাঙালি মুসলমানদের কালচার বলতে একাংশ ধর্মীয়, বেশি অংশ হিন্দী ফ্লিম। কিছু অবশ্য এখনও উর্দু শায়ের গজল ইত্যাদিকে নিয়ে টিকে রয়েছে। কিন্তু বাঙালি মুসলিমের কালচার মুখ্যত হিন্দু মুসলিম কালচারের একটা সমন্বয়।"**[৪] দেশভাগের পর এপার বাংলায় সেভাবে অবাঙালি মুসলমান দেখা যায়নি। খানদানি বা অবাঙালি মুসলমান যারা এপার বাংলায় পড়ে থেকেছে, তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে এই শ্রেণির মুসলমানদের কালচার বা সংস্কৃতির চিত্র সেভাবে দেখা যায়নি। তাঁর 'রুস্তম ও সোহরাবের বৃত্তান্ত' গল্পে এই খানদানি বা অবাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। পারু সায়গলের গান করে। এই প্রসঙ্গে গল্পকথক বলেছেন, **"...সে শিস দিয়ে অভ্যাসবশতঃ প্রিয় পুরনো একটা গান গাইতে শুরু করল। গানটা তার খুব ছেলেবেলায় শোনা। সায়গলের গান। মনে তিক্ততা এলে বরাবর সে এই গানটা শিস দিয়ে গায়।"**[৫] এই খানদানি বা অবাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতি কীরকম ছিল তা এই পারুর দিক থেকে বুঝতে পারা যায়।

শিক্ষার দিক থেকে মুসলমান সমাজের এই নিম্নশ্রেণি একেবারে অজ্ঞ বা অনেক পিছিয়ে থাকলেও হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে পূর্ণ লোকসংস্কৃতি বা বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাঁর 'সাজ ভেসে গেছে' গল্পটিতে লোকসংস্কৃতির দিকটি গভীরভাবে উঠে এসেছে। বন্যায় বেহুলা দলের শিল্পীদের অন্যান্য

সরঞ্জামসহ সাজ ভেসে যাওয়া এবং শিল্পের প্রতি তাদের ভালবাসার দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। দরিদ্র এই শিল্পীরা সাজ কেনার সাহায্যের জন্য ব্লকের অফিসারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু সাহায্য না মেলায় খালি হাতে ফিরে আসায় গভীর দুঃখে দলের প্রধান মওলা বখ্শ সেখ মারা যায়।

বেহুলা দলে অশিক্ষিত মওলাবখ্শ চাঁদ সওদাগর সাজতো। সে ছিল পালোয়ান, তাই চাঁদের ভূমিকায় তাকেই মানাতো ভালো। গহর আলি ছিল পাকা ছড়াদার বা কবিয়াল। সে ছিল অল্প স্বল্প শিক্ষিত। ভালো ছড়াদার হতে গেলে সামান্য শিক্ষা প্রয়োজন। রামায়ণ, মহাভারত সহ বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ পাঠ করেছিল ও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি রপ্ত করেছিল। একবার পৌরাণিক কবিয়ালিতে গহর মেডেলও পেয়েছিল। গহরের মতো শিল্পীদের শিল্পের প্রতি ভালোবাসা এমন প্রগাঢ় যে নিজের সংগ্রহ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বন্যায় ভেসে গেলে রমজানের কাছে বিভিন্ন পুরাণের গ্রন্থ সংগ্রহ করেছে কিছু দিনের জন্য। এই রমজানও বিভিন্ন শাস্ত্র-পুরানতত্ত্বে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। পদ্মাপুরান, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকা পুরাণ, প্রভাসখণ্ড বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থ নিজেই সংগ্রহ করেছিল। তার পুরাণের জ্ঞান এত ছিল যে বড় বড় কবিয়ালি আসরে পৌরাণিক প্রশ্নের বাণে সকলকে বধ করে ছাড়তো। সে এসবের পাশাপাশি আল্লাহ'র আদেশ হিসেবে নামাজও পড়তো। তার ইচ্ছা ছিল বড় ছড়াদার হবে। কিন্তু হতে পারেনি। হয়তো ধর্ম আর শিল্পের দ্বন্দ্বে ধর্মই জয়ী হয়েছিল- শিল্প গিয়েছিল দূরে সরে।

বংশ পরম্পরা এবং শিল্পের প্রতি ভালবাসার তীব্র তাগিদে এইসব লোকশিল্পীরা উঠে আসে। বাহাসতুল্লা বেহুলা দলের শিল্পী, তার দাদুও বেহুলা দলের শিল্পী ছিলেন। এই লোকশিল্পীদের বংশপরম্পরার কথা মতির বক্তব্যে উঠে এসেছে, **"তিন পুরুষের দল, সার। নিবাস আলি গোমস্তা পালাটা নেকেছিলেন আমার কর্তাবাবার আমলে। সেই খাতা এখনও আছে। তা থেকে নক্‌লে নিয়ে চলছে।"**[৬] বাহাসতুল্লার দাদুও বেহুলার পালা করতেন। তিনি পুরুষ হয়েও নারি বেহুলার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করতেন। বাহাসতুল্লা এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছে, **"ছেলেবেলায় তিনি বেউলো সাজতেন ! তেমন বেউলো আর হবেনা সার। মৌরীতলার বাবুদের কেষ্টযাত্রার দল ছিল। ওনারা দুবছর আটকে রেখে রাধিকে করেছিল। ...বাঁশির মতো গলা আর চেহারাও সার তেমনি।"**[৭] ওহাবি ও ফারাজী আন্দোলন মুসলমানদের এই লৌকিক সংস্কৃতির বিকাশের পথে আঘাত হানলেও সংস্কৃতির এই দারকে পুরোপুরি বন্ধ করতে সমর্থ হয়নি। বিভিন্ন লোকসংগীত সহ বিভিন্ন লোকশিল্প মুসলমান সমাজে তারপরেও অবাধে চালু থেকেছে। আকাশ আলি যে লখিন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করে, সে ফরাজি ঘরের কন্যাকে তালাক দিয়েছে। লোকশিল্প থেকে সে নিজেকে বিচ্যুত করেনি। তার ধার্মিক পিতা আব্বাস হাজিরও সেখানে সমর্থন। তাঁর মতে, **"ছেলে নকাই সাজে তো কী করবে? যৈবনে মানুষ বুনো ঘোড়া। বয়স হলে তখন তৌব্বা করে মক্কা যাবে। ব্যাস!"**[৮]

'একটি অনুসন্ধান' গল্পেও লোকসংস্কৃতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বা তাদের ভূমিকার দিকটি উঠে এসেছে। 'বেহুলা'র পালায় লখিন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করতো কাজেম (কাসেম?) আর হামদু (হামিদ) চাঁদ সওদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করতো। গাজলুর আঠারো পুরাণ সহ রামায়ণ মহাভারত সবই ছিল মুখস্থ। শুধু তাই নয়, দেবীর বন্দনাগীত প্রসঙ্গে গানলুর কথা বলতে গিয়ে প্রহ্লাদ খুড়ো বলেছে, "মা **সরস্বতীর বন্দনা গাইছে গানলু চাচা। পকেটে ধুতির কোঁচা। জমিদার বাবুর কাছারিতে পুজো। পিতিমার দিকে তাকিয়ে এককলি গাইতেই মা দুর্গার চোখ থেকে জলের ধারা।"**[৯] 'গাজনতলা' গল্পে তোরাপ ন্যাংটেশ্বর মন্দির তলায় গাজনে মড়ার মাথা নাচানোর জন্য চুলে জটা বাঁধায়, কপালে সিঁদুর মাখে, বুকে ঝোলায় রুদ্রাক্ষের মালা। জাগিয়ে রাখা মড়ার মাথা নাচায় আর মানকির হোসেনের দল ছড়া গায়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিজেও দেখেছিলেন যে, লৌকিক স্তরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক সমন্বয় এক সময়ে বর্তমান ছিল। আলকাপ দলে ঘোরাঘুরি করার সময়ে এই চিত্রটি তিনি বেশি করে দেখেছিলেন। কবিগানের লড়াইয়ে শেখ গোমানির মতো শিল্পীদের দেখেছেন, যাদের হিন্দু পুরান ও উপপুরানের অনেক কাহিনি একেবারে মুখস্থ ছিল। 'অগ্নিবলয়' গল্পে এই শেখ গোমহানী কবিয়ালের কথা রয়েছে। এই গোমহানী কবিগানের

আসরে জোর কণ্ঠস্বর দিয়ে বলে, **"আমার বুকের রক্তে হোক এবার তোমার পায়ের আলপনা।"**[১০] 'মরজিনা আবদুল্লা' গল্পে গল্পকথক আলকাপ দলের মাস্টার। এছাড়া আউল বাউল ও ফকিরের কথা রয়েছে এই গল্পে। শাজাহান ফকির এবং আবদুল্লা ফকির আসরে গান করে। শাজাহান ফকিরের গানের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ে পূর্ণ লোকসংস্কৃতির দিকটি উঠে এসেছে। সুফি মতের এই ফকির হরিণমারায় এক আসরে গায়, **"রাম কী রহিম করিম কালুল্লা কালা।/যারে মা ফাতেমা বলি / তিনিই হলেন দুর্গাকালী/ তেনার পুত্র হাসানহোসেন/ (যেন) কার্তিকগণেশ মদিনায় করেন খেলা।"**[১১] আবদুল্লা ফকিরেরও হিন্দু পুরাণ ও মুসলমান পুরাণের বেশিরভাগ মুখস্থ।

কিন্তু লোকসংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটেছে ক্রমে ক্রমে। লোকসংস্কৃতি ছাড়া বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালির অবক্ষয়কে রোধ করা সম্ভব নয়। 'একটি অনুসন্ধান' গল্পে প্রাথমিক শিক্ষক হবিবুর সহ অনেকেই আঙ্গুরার পীরের মাজারকে কেন্দ্র করে উরস পালন ও মেলা বসানোর সঙ্গে সঙ্গে বাউল ফকির গানের আয়োজন করেছেন। কিন্তু দূরদর্শন বা আধুনিক বিনোদনের নানা উপায় এই লোকসংস্কৃতির অবক্ষয়কে করেছে তরান্বিত। 'প্যাটলার' গল্পে দেখা যায় সদরু হাজির বসানো ভিডিও সেটে হিন্দি ছবি সহ ব্লু ছবি দেখানো হয় দশ টাকা মূল্য দিয়ে। সেখানে গ্রামের যুবকেরা ভিড় জমায়, সদরু হাজির এই কুরুচিপূর্ণ ব্যবসা জমে ওঠে রমরমিয়ে। প্রবীণ প্যাটলাদের প্রাচীন গাজনের সংস্কৃতিময় স্মৃতি ছুঁয়ে বসে আর আজকের গ্রামীণ সংস্কৃতির অবক্ষয় দেখে মন্তব্য করেন, **"মানুষ আর মানুষ নাই, কুকুর। কবে দেখবে ঘরের বউঝিরাও দশ টাকা লিয়ে লাইন দিয়েছে।"**[১২] শুধু তাই নয় রাজনীতিও এই লোকসংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> *"এখন আর সে গ্রাম নেই। গ্রাম শেষ হয়ে যাচ্ছে পঞ্চায়েত ঢুকে। আজকে গ্রামে কোনও মানুষকে আপনমনে গান করতে শুনিনা। এর চেয়ে সাংঘাতিক কি কিছু হতে পারে। আগে গ্রামে গেলে রাত্রিবেলায় গান গাইতে গাইতে লোকে বাড়ি ফিরছে - শুনতে পেতাম। এখন কেউ গান গায় না, শুধু পঞ্চায়েত আর দলাদলি।"*[১৩]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর ছোটগল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহিনিকে অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে রচনা করেছেন। মুসলমান সমাজে দারিদ্রের জন্য আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দেখা যায়নি। আবার দরিদ্র চাষাভুষো মানুষদের কাছে শিক্ষা তো কোনো কাজেই লাগেনা। ধর্মীয় প্রভাব সেখানে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের চেয়ে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে বেশি করে। কিন্তু পরে পরে খানদানি মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র এই মুসলমানেরাও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এই মুসলমান সমাজে সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ে পূর্ণ লৌকিক সংস্কৃতি অতীতে যেভাবে ছিল, বর্তমানে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর জন্য ধর্মীয় ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির দিকটি সেখানে ক্রিয়াশীল থেকেছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তারাচাঁদের হাসি, গল্পসমগ্র (২য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।

২। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, উড়োচিঠি, গল্পসমগ্র (৪র্থ খণ্ড),করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩৭।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮।

৪। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রেম ঘৃণা দাহ, পৃষ্ঠা ৩৭০ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, উপন্যাস সমগ্র (১ম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০১০, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, পৃষ্ঠা ৩৭০।

৫। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, রুস্তম ও সোহরাবের বৃত্তান্ত, কালের প্রহরী, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩০২।

৬। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সাজ ভেসে গেছে, গল্প সমগ্র (১ম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ১১৯।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৯।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮।

৯। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, একটি অনুসন্ধান, গল্প সমগ্র (৪র্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯।

১০। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অগ্নিবলয়, বিষ্ণু বসু অশোক কুমার মিত্র (সংকলন ও সম্পাদিত), সম্পর্ক সম্প্রীতি বিষয়ক গল্প সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ৩৪৮।

১১। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মরজিনা আবদুল্লা, কালের প্রহরী, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬০।

১২। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্যাটলার, গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমারলেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১১৮।

১৩। অনিন্দ্য সৌরভ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মুখোমুখি, ঐক্য,সম্পাদক গৌরীশঙ্কর সরকার,হবিবপুর, ডাক: মেদিনীপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, , ৭২১১০১, অক্টোবর ২০১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩৫।